দুর্যোগ কবলিত হাইতি

যে-কথা কর্পোরেট মিডিয়ায় ঠাঁই পায় না

।। ভ্যানগার্ড প্রতিবেদক ।।

ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপদেশ হাইতিতে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল গত ১২ জানুয়ারি। তার ফল কী হয়েছে প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে তা সবারই জানা থাকার কথা। দেশটির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্স আক্ষরিক অর্থেই গুঁড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে বস্তি পর্যন্ত সব ধরনের ভবন বা ঘর ভেঙে

পড়েছে। হাসপাতাল, জেলখানা, বিমান বা সমুদ্র বন্দর – কোনো কিছুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ইতোমধ্যে, ২ লাখ মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে আরও অন্তত লক্ষাধিক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। জীবিত মানুষেরা খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা এমনকি একটু বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে ছুটোছুটি করছে। মৃতদের লাশ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি সেদিকে তাকানোরও তাদের কোনো ফুরসত নেই। সেখানে সত্যিকার অর্থেই এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে, যদিও বহু দেশ তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কর্পোরেট প্রচারমাধ্যমের দৌলতে হাইতির কপালে বহু আগেই একটা তথাকথিত ব্যর্থ রাষ্ট্রের তিলক লেগে গিয়েছিল। ভূমিকম্প পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে ওই ধারণা আরও পোক্ত হবে; যে কারও মনে হতে পারে যে, হাইতি বরাবরই একটা দরিদ্র-দুর্নীতিগ্রস্ত-বিপন্ন জনপদ। এ ধারণা পোক্ত হওয়ার আরেকটা কারণ হল, আমেরিকা সেখানে ১০ কোটি ডলার সাহায্যের পাশাপাশি ১০ হাজার সেনা পাঠানোরও ঘোষণা দিয়েছে এবং সাহায্য পৌঁছানোর আগেই ৩০০ মেরিন সেনা সেখানে পৌঁছেও গেছে। আর এসব 'ত্রাণ' কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই যুদ্ধবাজ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জুনিয়র জর্জ বুশকে, যেন হাইতিতে নিজস্ব কোনো সরকার নেই এবং সাহায্য জোগাড় করাতো বটেই সাহায্য ব্যবহার করার ক্ষমতাও জনগণের নেই। হাইতি কি আসলেই এতটা অসহায় ও অক্ষম? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে একটু হাইতির ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

পশ্চিম গোলার্ধের এ ছোট্ট দেশটি একসময় বেশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এ কারণেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বারবার সেখানে হানা দিয়েছে। আফ্রিকা থেকে গায়ের জোরে কালো মানুষদেরকে ধরে এনে এখানে দাস হিসেবে খাটিয়েছে। দাসযুগে ফ্রান্সের সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে হাইতি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। তখন আজকের ডোমিনিকান রিপাবলিক হাইতির সাথে যুক্ত ছিল। এর নাম ছিল হিস্পানিওয়ালার দ্বীপ। এখানে প্রচুর চিনি, কফি ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হত। এ কারণে অন্তত তিন শতাব্দী ধরে দ্বীপের দখল নিয়ে ফরাসী, স্প্যানিশ ও ব্রিটিশদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে। হাইতির গুরুত্ব বোঝা যায় 'লুইজিয়ানা ক্রয়' এর ঘটনায়। ১৮০৪ সালে হাইতির স্বাধীন হওয়ার পর ফ্রান্স এতটাই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় যে তখন তা পোষাতে সে তার দখলে থাকা 'লুইজিয়ানাসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল (প্রায় ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮০০ বর্গমাইল এলাকা, বর্তমান আমেরিকার ২৩ শতাংশ) আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আমেরিকানরা এ ঘটনার নাম দিয়েছে 'লুইজিয়ানা ক্রয়'। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো শত শত বছর ধরে হাইতিতে শুধু লুণ্ঠনই চালায়নি রক্তগঙ্গাও বইয়ে দিয়েছে। আজকে দেশটি কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত হলেও একসময় সেখানে আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কলম্বাস সেখানে পা রেখেছিলেন ১৪৯২ সালে। তখন সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু এর মাত্র ৪৩ বছর পরে সেখানে মাত্র ৫০০ জন আদিবাসীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তবে কৃষ্ণাঙ্গরা দাস হিসেবে আসলেও দেশটিকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং এর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বহু আত্মদান করেছেন। ১৭৯১ সালে বোফম্যানের নেতৃত্বে সেখানে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে ৫ লাখেরও বেশি দাস, হাজার হাজার মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ও মিশ্র বর্ণের মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ওই বিদ্রোহের মাধ্যমে ২০০ চিনি খামার, ৬০০ কফি খামার ও ২০০ নীল খামার

ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল। এর বলি হয়েছিলেন ১২০০০ মানুষ যাদের মধ্যে ২০০০ ছিল ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারী। ওই বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত ১৮০৪ সালে হাইতি স্বাধীনতা লাভ করে। হাইতি হল পৃথিবীর প্রথম স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্র।

তবে তাদের এ স্বাধীনতাকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো কখনোই মেনে নিতে পারেনি। তাই হাইতিকে তাদের পদানত রাখার চক্রান্ত লেগেই ছিল। যেমন, ১৮০৪ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমেরিকা ও ফ্রান্স হাইতির বিরুদ্ধে কঠোর অবরোধ জারি করে। ফ্রান্স হাইতিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। এ পরিণামে ১৮২৫ সালে হাইতি ফ্রান্সের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের দাবি ছিল, ১৭৯১-১৮০৩ এর বিদ্রোহে দাস মালিকদের যেসব সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করা। এর ফলে হাইতির অর্থনীতির ওপর ফ্রান্সের আধিপত্য চলে উনিশ শতক জুড়ে। ১৮৮০ সালে হাইতির ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিচালনার ভার ছিল ফরাসীদের হাতে। এর তহবিলও যোগায় ফরাসীরা। ফরাসীদের এ কর্তৃত্ব চলে ১৯১৫ সাল অবধি। ওই বছর আমেরিকা হাইতি দখল করে। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের পাশাপাশি আমেরিকাও ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাইতির স্বাধীনতা স্বীকার করেনি। ১৮৬২ সালে আমেরিকায় এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দাস প্রথার অবসান হয়। ওই বছরই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন হাইতিকে স্বীকৃতি দেন।

আমেরিকা ১৯১৫ সালে হাইতি দখল করে নেয়ার পর প্রচণ্ড গেরিলা প্রতিরোধের মুখে পড়ে। পরিণামে ১৯৩৪ সালে সে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তারপরও নয়া-ঔপনিবেশিক কায়দায় হাইতির ওপর আমেরিকার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে, আজও যার অবসান ঘটেনি। যেমন, ওই বছরই আমেরিকা সেখানে একটা সরকার বসায় যাকে বলা হত 'গার্দে দ্য হাইতি' (হাইতির পাহারাদার)। এ তথাকথিত পাহারাদারের বাস্তবে কাজ ছিল আমেরিকার স্বার্থ পাহারা দেওয়া। এরপর ১৯৫৭ সালে তারা কুখ্যাত স্বৈরশাসক 'পাপা ডক' দ্যুভিলিয়রকে ক্ষমতায় বসায়, যিনি নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন তার ছেলে জ্যঁা ক্লদ দ্যুভিলিয়র। হাইতির জনগণ আবারও বিদ্রোহে ফেটে পড়েন, এর মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালে দ্যুভিলিয়র শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু কোনো সংঘটিত রাজনৈতিক দল বা শক্তি না থাকাতে ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনীর হাতে। জনগণের উত্তোরোত্তর বিক্ষোভের মুখে সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ১৯৯১ সালে। ওই নির্বাচনে আমেরিকার ছকের বাইরে জ্যঁা-বার্টান্ড অ্যারিস্টাইড জিতে যান। তিনি হাইতিকে সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ হতে মুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। তারই অংশ হিসেবে একদল স্বেচ্ছাসেবককে স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ান দেশগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু সাথে সাথে আমেরিকা ক্যু-দেতার মাধ্যমে তাকে উৎখাত করে ওয়াশিংটনে নিয়ে যায়। তবে জনসমক্ষে প্রচার চালানো হয় যে, অ্যারিস্টাইডের নিরাপত্তার জন্যই তাকে ওয়াশিংটনে আনা হয়েছে। এক পর্যায়ে, ১৯৯৪ সালে তাকে আবারও ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয় এই শর্তে যে, তিনি মাত্র এক বছর ক্ষমতায় থাকবেন। এরপর ১৯৯৫ সালে সেখানে মাত্র ২৫ শতাংশ ভোটারের অংশগ্রহণে প্রহসনমূলক এক নির্বাচনের মাধ্যমে রেনে প্রেভালকে রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয়।

২০০০ সালের নির্বাচনে আমেরিকা অ্যারিস্টাইডকে ঠেকাতে পারেনি। তিনি আবারও বিপুল ভোটে জয়ী হন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মাথায় আমেরিকার ইন্ধনে তার বিরোধী পক্ষ এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে, যার সুযোগ নিয়ে মার্কিন সেনারা অ্যারিস্টাইডকে রীতিমত অপহরণ করে ওয়াশিংটনে নিয়ে যায় এবং শেষ মেষ তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ী নির্বাসনে পাঠায়। এদিকে, মানবিক মিশনের আড়ালে আমেরিকা, ফ্রান্স ও কানাডার সেনারা হাইতির দখল নেয়। পরবর্তী সময়ে আমেরিকা জাতিসংঘের দ্বারা তাদের এ দখলদারিত্বকে অনুমোদন করিয়ে নেয়। বর্তমানে তথাকথিত ওই শান্তিরক্ষীদের কাজ হলো, অ্যারিস্টাইডের প্রতি অনুগত রাজনৈতিক দল ফ্যানমি লাভালাস-এর সদস্য ও সমর্থকদের খুন, গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাধ্যমে দমিয়ে রাখা। ভূমিকম্পের পর হাইতিতে ওবামা কর্তৃক ১০ হাজার মেরিন সেনা পাঠানোর শানে নুজুলও এর মধ্যেই নিহিত আছে।

অ্যারিস্টাইডের অপরাধ হল তিনি আমেরিকার দেওয়া অর্থনীতির নয়া-উদারিকরণ প্রস্তাবে সায় দেননি। তাকে বলা হয়েছিল নয়টা প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে, আমেরিকার বা অন্য কোনো বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে। তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু রেনে প্রেভাল (অ্যারিস্টাইডের জায়গায় যাকে বসানো হয়) ক্ষমতায় বসেই ময়দা ও সিমেন্ট কারখানা দু'টো বিক্রি করে দেন। ময়দা কারখানা যায় একটা বিদেশি কোম্পানির হাতে যার বোর্ড মেম্বার হলেন হেনরি কিসিঞ্জার, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যার চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কাহিনী এদেশের মানুষের জানা আছে। কিন্তু, কিছুদিন পরই ওই ময়দার মিলটি ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, বর্তমানে হাইতিতে- না সরকারি না বেসরকারি- কোনো ময়দার মিল নেই। পুরো ময়দাটাই আমদানি করতে হয়। সিমেন্টের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে হাইতি হল,

চুনা পাথরের দেশ, সিমেন্ট তৈরিতে যার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ওই একমাত্র সিমেন্ট কারখানাটি বেসরকারিকরণের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে এখন সমস্ত সিমেন্টই আমদানি করতে হয়। কী নির্মম পরিহাস! যার হওয়ার কথা সিমেন্ট রপ্তানিকারক সে হয়েছে আমদানিকারক। হাইতির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তেলেকু বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পর পুরো টেলিযোগাযোগ খাত এখন মাত্র ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান – ডিজিসেল, ভয়লা ও হাইটেল-এর দখলে। আমরা দেখেছি, একসময় হাইতির কৃষি খুব সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু তা-ও দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং পরবর্তী সময়ে নয়া-উদারিকরণের ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামীন অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ায় দলে দলে অসহায় লোকেরা শহরে ভীড় করছে, আর বেকারদের ভারে শহরের জীবন-যাত্রা ভেঙে পড়েছে। যার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে ২০০৮ সালের খাদ্য দাঙ্গায় এবং সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে।

বর্তমানে হাইতির প্রশাসন আমেরিকার পুরো নিয়ন্ত্রণে হলেও জনগণের বিদ্রোহ-বিক্ষোভ কিন্তু থেমে নেই। কিছুদিন আগে অ্যারিস্টাইডের বিরুদ্ধে ক্যু-দেতার দিনটি স্মরণ করে ফ্যানমি লাভালাস-এর ১০ হাজার সমর্থক বিক্ষোভ করেছে। তাদের প্রধান দাবি ছিল জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে বিদেশি দখলদারিত্বের অবসান এবং অ্যারিস্টাইডের দেশে ফেরার অধিকারের বাস্তবায়ন। বিক্ষোভ এর পরেও সেখানে হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, অ্যারিস্টাইডের এ জনপ্রিয়তা দেখে হাইতির পুতুল সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এ কারণেই তারা দেশের একমাত্র বিমানবন্দরের ভার মার্কিন সেনাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ওখানে ইরাক বা আফগানিস্তানের মত যুদ্ধ চলছে না, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মত কোন গৃহযুদ্ধ চলছে না, তার পরও হাজার হাজার মার্কিন সেনার উপস্থিতি ঘটানো হয়েছে। একটা বিষয় হয়ত সবার নজরে পড়েছে যে সামপ্রতিক দশকে সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রভাবে গোটা ল্যাটিন আমেরিকা জেগে ওঠেছে, কলম্বিয়ার মত দুএকটা দেশ ছাড়া আর সব জায়গা থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে। এর কিছু হাওয়া হাইতির গায়েও লেগেছে। অ্যারিস্টাইডের উত্থান সে বার্তাই দিচ্ছে। তাই, আমেরিকা যে কোন মূল্যে হাইতিকে তার দখলে রাখতে চায়। কিন্তু, এতেও যে শেষ রক্ষা হবে, এমনটা বলা যায় না। যে জাতি বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ করে ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাড়িয়েছে, এবং শত দুর্যোগ-অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে জাতি অদম্য। জয় তাদের হবেই।